উপনিবেশের উত্তরাধিকার

বিগত শতাব্দীর শুরু থেকেই উপমহাদেশীয় মুসলিমদের আলেম থেকে আওয়ামদের বিরাট এক অংশ, মুসলিম নামধারী সেক্যুলারদের পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তাদের নের্তৃত্ব মেনে নিয়েছে।

এটা কি কেবলই ফিকহের কিতাবের কোনো বিচ্ছিন্ন মাসআলার ভুল প্রয়োগ?

নাকি তা স্রেফ কোনো রাজনৈতিক ভুল!?

শতবছর আগের রেশমী রুমাল আন্দোলনের পর থেকেই উলামায়ে কেরামের অংশবিশেষ ও ইসলামপন্থীদেরকে আমরা দেখছি- মুসলিম লীগ, কংগ্রেসের, আওয়ামী লীগ, বিএনপি, বা পিপিপির মতো সেক্যুলার দলগুলোরই অধীনস্ততা মেনে নিয়ে নিযুত-কোটি মুসলিমদের গণতান্ত্রিক মেহনতে মশগুলে আহবান জানাতে।

অর্থাৎ, উপমহাদেশের মুসলিমদের মাঝে আকারে ছড়িয়ে পরা "সেক্যুলার মুসলিম জাতিয়তাবাদ" নামক এই ভয়ংকর 'আদর্শিক' মারণব্যাধি আসলে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের জঠর থেকেই উদগত।

ইতিহাস ও বাস্তবতার বিশ্লেষণের আলোকে দেখা যায়, '৪৭ এর 'আজাদি' বা '৭১ এর 'মুক্তিযুদ্ধ' আমাদের স্বাধীন করেনি। বরং ক্রমান্বয়ে পরাধীনতার শেকল আরো মজবুতই করছে কেবল।

আমরা যদি নির্মোহ দৃষ্টিতে উপমহাদেশে ইসলামের নের্তৃস্থানীয় উলামায়ে কেরাম এবং তালিবে ইলমদের দিকে আলোকপাত করি একথা নির্দ্বিধায় বলা সম্ভব ঐতিহাসিকভাবে ইসলামের জন্য জীবন ও সম্পদ ওয়াকফ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের আন্তরিকই পাবো।

একই কথা বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও মধ্যম সারির নেতাদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। আর আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

কিন্তু কয়েকশ বছরের ইসলামী শাসন ব্রিটিশদের হাতে পতিত হওয়ার পর মুসলিমরা উপমহাদেশে ইসলামের ক্ষমতায়ন আজও ফিরিয়ে আনতে পারেনি।

পাশাপাশি অল্পসংখ্যক ব্যতিক্রম ব্যতীত সামগ্রিকভাবে মুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা নিম্নগামীই বটে। ইসলামের পরিবর্তে ইসলামের শত্রুদের উপকারেই মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে।

লক্ষ-কোটি আলেম-উলামা, তালিবে ইলম, দাঈ এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মীর উপস্থিতি ও সক্রিয়তা সত্ত্বেও কেন সামগ্রিকভাবে উপমহাদেশে ইসলামের অধঃপতন অনিবার্য হয়ে উঠল?

সংক্ষেপে হলেও, যদি এর কারণ ও উৎস অনুসন্ধান আমরা না করি, তবে পরিস্থিতির উত্তরণ সম্ভব না হওয়ার আশংকা থেকে যায়।

এক কথায় বলতে গেলে মুসলিমদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে ব্যাপক বিপর্যয় ও নিরাপত্তাহীনতার অন্যতম কারণ হলো মুসলিমদের জনপদে ইসলামের কর্তৃত্ব না থাকা; রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাক্তিগত স্তরেও হস্তক্ষেপের ক্ষমতা ইসলামের শত্রু মডার্নিস্ট, সেকুল্যারদের হাতে থাকা। মুসলিমদের মাঝে যারা ন্যূনতম আকলসম্পন্ন এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিক সকলেই এতে একমত।

কোনো সন্দেহ নেই মাদ্রাসা, খানকা, দাওয়াতের মারকাজগুলো, ওয়াজ-নসিহতের মঞ্চগুলো কিংবা বিভিন্ন রাজনৈতিক ইসলামী সংগঠনের তৎপরতা এই উপমহাদেশকে আন্দালুস বা বুখারা-সমরখন্দের পরিনতি বরণ করা থেকে নিরাপদ রাখতে ভূমিকা রেখেছে।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে সাধারণত দুইটি ভুল চিন্তার সন্নিবেশন ঘটে থাকে-

ক) নিকৃষ্টতম অবস্থায় না পৌছানোকে করে আদর্শ অবস্থা মনে করে, স্বীয় খেদমতকে ইসলামের জন্য পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি মনে করা।

অর্থাৎ, ব্যাক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে নির্দিষ্ট কিছু দীনি স্বাধীনতা লাভকেই ইসলামী রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য সাব্যস্ত করা।

খ) অর্জিত সাফল্যকে কেবল বাহ্যিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং দর কষাকষির ফলাফল মনে করা।

অথচ,

ঐতিহাসিকভাবেই, মুসলিম-অমুসলিম সকল গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, শত্রুপক্ষ তাদের উপর পরাক্রম হওয়ার পর যদি বিপ্লব বা সশস্ত্র প্রতিরোধের আশঙ্কামুক্ত হতে না পারে, তখন তারা বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ চিন্তাধারা ও কর্মসূচীর মাঝে বিপ্লবী চিন্তাধারাকে বেঁধে ফেলতে চায়।

অর্থাৎ ইসলামের শত্রুরা বিভিন্ন ইসলামী জামাতের প্রতি যে আপোষমূলক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে, তার মূল কারণ হচ্ছে, ঢালাও চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের নিশ্চিহ্ন করতে গেলে পাল্টা বিপ্লবের আশঙ্কা দেখা দেয়া।

যেমন, ১৮৫৭ এর বিপ্লবের পর ইংরেজ দালাল স্যার সৈয়দ আহমদ তার 'আসবাবে বাগওয়াতে হিন্দ' বা 'হিন্দে বিদ্রোহের কারণ' রিসালাতে এ নিয়ে আলোচনা করেছে।

আটশ বছরের ইসলামী শাসন, সামরিক বিজয় এবং মহান উলামায়ে কেরাম ও দা'ঈদের অক্লান্ত মেহনতের ফলে উপমহাদেশের সমাজে প্রোথিত হয়ে যাওয়া ইসলামী মূল্যবোধকে সমূলে উপড়ে ফেলা ইসলামের শত্রুদের এখনো অসম্ভবই বলা যায়।

তবে, যে বিষয়টি একেবারেই এড়িয়ে যাওয়া হয় তা হচ্ছে, কিছু সংস্কারমূলক কার্যক্রম চালু রাখা (যার জাতীয় জীবনে নগণ্য ভূমিকা রয়েছে) এক বিষয়; আর জমিনে কুফুরি শাসনের পতন ঘটিয়ে ইসলামের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বিষয়।

যারা ইসলামী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তাদের জন্য এ বিষয়টি উপলব্ধি করা অত্যাবশ্যক। কেননা প্রতারণামূলক স্লোগান আর ধোঁয়াশাপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে সম্ভাবনাময় যুবক শ্রেণীর অনেকেই শরীয়াহ কায়েমের সংকল্প থাকা সত্ত্বেও ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে।

যার ফলাফল তো এই যে, উপমহাদেশে মুসলিমদের অধীনে প্রয়োজনীয় জনশক্তি, অর্থ বা ভৌগোলিক গভীরতার উপস্থিতিসহ কার্যকর উপকরণাদি থাকা সত্ত্বেও, আড়াইশ বছরেও মুসলিমদের উত্থান তথা ইসলামী শাসন ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলো না।

فَهَلۡ يَنۡظُرُوۡنَ اِلَّا سُنَّتَ الۡاَوَّلِيۡنَ ۚ فَلَنۡ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبۡدِيۡلًا ۚ وَ لَنۡ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحۡوِيۡلًا

"কিন্তু আপনি আল্লাহর পদ্ধতিতে কখনো কোন পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর পদ্ধতির কোন ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করবেন না।"

(সূরা ফাতির, ৩৫:৪৩)

অর্থাৎ একথা সুনিশ্চিত যে, দুনিয়ার ব্যবস্থাপনায় আল্লাহ তা আলার বিধান চিরন্তন ও অলঙ্ঘনীয়। এর প্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতিগোষ্ঠীর উত্থান-পতন ও অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সুনির্ধারিত সূত্র রয়েছে।

যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইতিহাসে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে বিভিন্ন জাতির উত্থান পতনের দিকে তাকায় আমরা দেখতে পাবো যে, দীর্ঘমেয়াদি বা ক্ষয়িষ্ণু, বিস্তৃত বা ক্ষুদ্র যে কোন রাষ্ট্রই সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনেই তামকীন লাভ করেছে। আবার তাদের অধঃপতনও হয়েছে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনেই।

কবি ইকবাল বলেন,

"আসো তোমাকে শোনাই জাতির উত্থান-পতনের সূত্র,

শুরুতে তার তরবারী-তীর, শেষে শরাব-সেতার আর নৃত্য।"

তাই, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোনো ঘটনা-দুর্ঘটনাই আকস্মিক বা বিচিত্র নয়, যদিও এর স্বপক্ষে আধুনিকতা বা "দুনিয়া বদলে যাওয়া"র যুক্তি দেয়া হোক না কেন।

শাইখ আবু মুসআব আস সুরী যে কোনো ইসলামী আন্দোলনের ব্যর্থতার মূল জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (ক) নের্তৃত্বের দুর্বলতা এবং (খ) ফিকর বা চিন্তার জগতে সংকট তৈরি হওয়াকে।

আবার, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফিকরের ময়দানে সংকটের কারণেই নের্তৃত্বের দুর্বলতা দেখা দেয়।

একইভাবে, ব্রিটিশদের হাতে উপমহাদেশের ইসলামী ইনসাফের সূর্য অস্তমিত যাওয়ার পর তা আরো উদিত না হওয়ার পেছনে ফিকরের সংকটকে দায়ী করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

তাই,

ইতিহাস থেকে আমাদের বোঝার চেষ্টা করা উচিৎ, ঠিক কোথায় আমাদের সমস্যার কেন্দ্র। আমাদের চিন্তার জগতে অনুরণন তুলতে ইতিহাসের আয়নায় আমাদের একাকী হলেও নিজেদের প্রতিবিম্ব পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।

কেননা, ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ সহজেই একজন আগ্রহী ও আন্তরিক মুসলিমের আগামীর করণীয় নির্ধারণ করে দিতে পারে।

উপমহাদেশের মুসলিমদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, চিন্তাশীল ও আন্তরিক তাদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা শূন্যের উপর শুরু করে পূর্ববর্তীদের কৃত ভুলসমূহের পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন।

বরং তাদের কাছে এটাই কাম্য যে, পূর্ববর্তীদের ইতিহাসের আলোকে নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যথাযথভাবে নির্ধারণ করবেন, সালাফদের পথ বেছে নেবেন এবং ব্যার্থদের পথ থেকে শত-সহস্র ক্রোশ দূরে থাকবেন।

(১)

'ইসলামী' সেক্যুলারিজমের জঠরঃ আলীগড় আন্দোলন!

১৮৫৭ সাল। ১০০ বছর আগে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর ক্রমান্বয়ে বাংলা, উড়িষ্যা, আসামসহ ভারতবর্ষের বিস্তৃত অঞ্চলের উপর শাসনকর্তৃত্ব লাভের মাধ্যমে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করলেও, তখনো সামগ্রিকভাবে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতীক ছিলেন মুঘল শাসক বাহাদুর শাহ।

উপমহাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের পতন ঘটাতে বাহাদুর শাহকে সামনে রেখে ব্যাপকভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় ভারতবাসী, যাতে অন্যতম প্রধাণ ভূমিকা রাখেন উলামায়ে কেরাম।

ব্যাপকভাবে অস্ত্রের মাধ্যমে, অতঃপর হিন্দুদের সাহায্যে মুসলিমদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিনস্ট করতে সর্বপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইংরেজরা।

বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যেসমূহের সর্বাগ্রে ছিল, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতীয়দের রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তি মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটানো।

এজন্য ব্রিটিশরা সর্বশেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে বার্মায় নির্বাসনে পাঠায় এবং তার সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা করে, যেন ছয়শ বছরের ইসলামি শাসনের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে যায়।

উপমহাদেশে এই রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণে ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানির নির্বাহী ক্ষমতা বিলুপ্ত করে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সরাসরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়; যা পরিচিতি লাভ করে "ব্রিটিশরাজ" নামে।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর ব্রিটিশরাজ বুঝতে পারে শুধুমাত্র জোরপূর্বক দমনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী শাসন সম্ভব নয়।

হিন্দু রাজপুত, অভিজাত হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম নামধারী কিছু দালালদের প্রশাসনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তায় ব্রিটিশরাজ উপমহাদেশে নিজেদের আইন-কানুন শক্ত হাতে বাস্তবায়নে সক্ষম হয়।

'৫৭'র বিদ্রোহে ব্রিটিশ-হিন্দুত্ববাদী অক্ষের সম্মিলিত জোটের কাছে ইসলামী শাসনের স্বপ্নদ্রষ্টাদের সাময়িক সেটব্যাকে ঘটে। আর ঠিক এসময়ই "মুসলমানদের পুনর্বাসন প্রকল্প" নিয়ে হাজির হন ইংরেজভৃত্য স্যার সৈয়দ আহমেদ।

তৎকালীন সময়ে ইউরোপ, বিশেষত ইংল্যান্ডে 'এনলাইটেনমেন্ট' আন্দোলন তথা মানবপূজার জয়জয়কার অবস্থা।

মডার্নিস্ট দার্শনিকদের (বিশেষত জন লক) দীক্ষায় দীক্ষিত, স্যার সৈয়দ আহমদ উপমহাদেশের মুসলিমদেরকে ইংরেজদের আধিপত্য মেনে নিয়ে এক অদ্ভুত চিন্তাচেতনার দিকে আহবান জানায়।

মুসলিমদের আদর্শিক অধঃপতনের মূল কান্ডারী ছিল স্যার সৈয়দ আহমাদ খান ও আলীগড় আন্দোলনের অন্যান্য জমিদার নেতাগণ। এই গোষ্ঠীটির মাধ্যমেই মুসলিমদের মাঝে সেকুলার জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটে।

মূলত এসব জালিমদের নিকট ইসলাম ছিল একটি প্রথা বা জাতিগত পরিচয়ের মাধ্যম মাত্র। তৎকালীন ইউরোপের রাজনৈতিক প্রভাব হারানো ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের মতো এসকল 'আশরাফ' মুসলমানরা ইসলামকে 'সেকুল্যার' চিন্তাধারার অনুগামী করতে আগ্রহী হয়।

ইউরোপে খ্রিস্টিয় শাসনের পতনের পর, প্রোটেস্ট্যান্ট তাত্ত্বিক আর শাসকদের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা, বাকস্বাধীনতা, গণতন্ত্র বা জাতীয়তাবাদের নামে যে মানবপূজা শুরু হয়; তা মুসলিম ভুমিগুলোতে মূলত ছড়িয়ে পরে মূলত স্বৈরাচারী উপনিবেশবাদের কল্যাণে।

ফ্রান্স, ব্রিটেন প্রভৃতি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন অস্ত্রের জোরে আলজেরিয়া, ফিলিস্তিন, সোমালিয়া, ভারতসহ বিভিন্ন ভুখন্ডে অর্থনৈতিক স্বার্থে কলোনি বা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তখনই এসকল ভুখণ্ডে তারা নিজ আদর্শের বীজ বপন করে।

এর উদ্দেশ্য ছিল, যেন স্থানীয় জনগণকে মানসিক দাসত্বের শেকল পড়িয়ে দীর্ঘদিন শোষণ করা সম্ভব হয়।

আর একাজে সহায়তার জন্য প্রতিটি দেশেই কিছু স্বতঃস্ফূর্ত দালাল শ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় শক্তিগুলো সাথে পেয়ে যায়। যার ফলে উপনিবেশবাদী

শক্তিগুলো জনগণকে ধোকায় ফেলতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে, শাসনক্ষমতা ও রাস্ট্রযন্ত্রে এসকল স্থানীয় আদর্শিক দাসদের অংশীদার করতে শুরু করে।

এউদ্দেশ্য এসকল দাসদের স্বীয় প্রভুদের শিক্ষায় দীক্ষিত হতে, ইউরোপীয় শক্তিগুলো স্থানীয়ভাবে এবং নিজ দেশে 'উচ্চশিক্ষা'র সুযোগ করে দিত।

অতএব,

স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই ব্রিটিশরা ১৮শ শতকে ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের কিছু সময় পরই স্থানীয় 'ইংরেজিশিক্ষিত' দালালের অন্বেষনে নেমে পরে।

ইংরেজদের 'আবিস্কৃত' প্রথম সারির দাসদের অন্যতম ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমাদ। যার প্রমাণ মেলে ১৮৫৭ সালের ইংরেজবিরোধী জিহাদের সময় তার ঘোর বিরোধীতা থেকে।

ইংরেজরা যেন মুসলমানদের সুযোগসুবিধা দানের মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করতে পারে তার রূপকল্প পেশ করে স্যার সৈয়দ!

কেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ তে বিদ্রোহ হয় তার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজকে সাহায্যকরণে তিনি রচনা করেন তার বহুল প্রচলিত পুস্তিকা 'আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ'!

ব্রিটিশ রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় স্যার সৈয়দ আহমেদ 'আলীগড় আন্দোলন' সূচনা করেন। এবং প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিমদের 'ইংরেজি বাবু' বানানোর নিমিত্তে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়।

উপমহাদেশে ইংরেজদের বিতারিত করে ৬০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শাসন ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে, ইংরেজদের গোলামী মেনে নিয়ে বাদামি চামড়া ইংরেজ হয়ে রুটি-রুজি আর কাফেরদের কাছে সম্মানিত হওয়ার তত্ত্ব ও দাওয়াত'ই ছিল আলীগড় আন্দোলনের মূল উপজীব্য।

ক্রমান্বয়ে ইসলামের দাওয়াত ও পরিভাষাকে ব্রিটিশদের উপযোগী আধুনিকায়নে বিস্তর লেখালেখি, শিক্ষাপ্রদান ও কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হয় স্যার সৈয়দ আহমদ এর আলীগড়ি লেখক-বুদ্ধিজীবিরা!

এই আলীগড় আন্দোলনের মাধ্যমেই মূলত মুসলিমদের মাঝে সেক্যুলার রাজনৈতিক চর্চার সূচনা।

সর্বপ্রথম সৈয়দ আহমদ ও তার অনুসারীগণই সেক্যুলারিজমের মন্ত্রে দীক্ষিত হোন। তারা মুসলিমদেরকে ইসলামী শরিয়াহর ছায়ায় ফিরে যাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে ইংরেজদের অধীনে দুনিয়াবি উন্নতিকেই বেছে নেয়ার আহবান জানায়। ইংরেজদের নিরঙ্কুশ আনুগত্য মেনে তাদের সর্বাত্মক সহায়তার মাধ্যমে সরকারি চাকুরি লাভে মুসলিমদেরকে হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগিতার আহ্বান জানায় স্যার সৈয়দ আহমেদ খান। যার এনামস্বরূপ ব্রিটিশ রানীর পক্ষ থেকে "নাইটহুড" খেতাব লাভ করতে সক্ষম হন সৈয়দ আহমেদ।

এছাড়াও তার 'সুযোগ্য' পুত্র সৈয়দ মাহমুদ ইংরেজদের অধীনে প্রথম 'মুসলিম' হিসেবে ব্রিটিশ কুফুরী আইনে পরিচালিত কোর্টের বিচারপতি হওয়ার 'গৌরব' লাভ করে।

বদর উদ্দিন লুলু যেমন তাতারীদের আনুগত্য স্বীকার করে মসুলের আমির হওয়াকে এবং মীরজাফর যেমন ব্রিটিশ আনুগত্য স্বীকার করে বাংলার নবাব হওয়াকে নিজেদের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছিল, তেমনি এই ধারার প্রধাণ দার্শনিক, জন লকের ভাবশিষ্য 'স্যার' সৈয়দ আহমদ খানও ব্রিটিশদের গোলামীর শিকল গলায় পড়ে দুনিয়াবী উন্নতির দিকে ছুটে যাওয়াকে মুসলিমদের প্রধান লক্ষ্য সাব্যস্ত করেন।

ইংরেজদের ছত্রছায়ায় ও প্রকাশ্য মদদে স্যার সৈয়দের এই চিন্তাধারা ব্যাপক আকার ধারণ করে। কেননা, সরলমনা, নিপীড়িত মুসলিমদের দুনিয়াবি দুঃখ-কষ্ট দূরীকরণে উচ্চবিত্তের মালিক স্যার সৈয়দ ও তার উত্তরসূরীদের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

জন লকের পাশাপাশি রাজা রামমোহন রায়ের রচনার ফারসি অনুবাদ পড়ে উজ্জীবিত হওয়া স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলিমদেরকে ইসলামের অনুগামী করার পরিবর্তে, মুসলিমদের সেক্যুলারাইজ করতে কলম হাতে তুলে নেয়।

ফার্সি, আরবীর ব্যবহার বিলুপ্ত করে ইংরেজিকে প্রশাসনিক ভাষার গুরুত্ব দেয়ার ফলে, যে সকল প্রজা শোষণকারী, নাক উঁচু ও নামকাওয়াস্তে মুসলিমরা (জমিদার, তালুকদার, মনসবদার) ইতিপূর্বে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল তারা দেখতে পেল

যে, ইংরেজদের গোলামী না করলে বসে বসে মানুষকে শোষণ ও শাসনের দিন শেষ হয়ে আসছে।

এ আলীগড় আন্দোলনের নেতাদেরই একাংশ পরবর্তীতে কংগ্রেসের নের্তৃত্ব গ্রহণ করে, আর আরেক অংশ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করে।

এবং পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পাশাপাশি কলোনিগুলোতে স্থানীয় বিদ্রোহের ফলে সৃস্ট চাপের মুখে- কলোনিগুলো ছেড়ে যাওয়ার সময়ও ফ্রান্স, ব্রিটেন ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো নিজেদের আদর্শিক দালালদের হাতেই উপনিবেশগুলোর ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে যায়। যেন এসকল রাস্ট্রের অর্থ ও রাজনৈতিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ না হলেও, সম্ভাব্য মুনাফা যেন হাসিল হতে থাকে।

উদাহারণত, ফ্রান্স তিউনিশিয়াতে তাদেরই একনিষ্ঠ ভক্ত হাবিব বুরগিবার হাতে স্বাধীনতার নামে শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করে যায়, ইন্দোনেশিয়াতে ডাচরা আহমদ সুকর্নকে ক্ষমতাসীন করে যায়।

একইভাবে, ব্রিটিশরা তাদেরই শিষ্য আলিগড় আন্দোলনের ফল জিন্নাহ-লিয়াকত-আগা খানদের আর আজাদ--মুহাম্মাদ আলী জহরদের হাতেই উপমহাদেশের ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিয়ে যায়।

কিন্তু জনগণকে ধোকায় ফেলতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে সেক্যুলারদের উত্তরসুরীরা ব্যাবহার করে স্বরাজ, আজাদি বা স্বাধীনতার মতো মুখরোচক বিশেষন। অথচ আনুষ্ঠানিকভাবে একে স্বাধীনতা নয়, ট্র্যান্সফার অফ পাওয়ারই বলা হয়।

অতঃপর ১৯৪৭ এর পর থেকে আলিগড়িদের উত্তরসুরীরাই হালের পাকিস্তানি পিএমএল, পিপিপি বা ভারতীয় এমআইএম কিংবা বাংলাদেশি বিএনপি, জাতীয় পার্টির কর্ণধার হয়ে কোটি কোটি মুসলমানের অন্তরে সেক্যুলারিজমের বিষ ঢেলে দিয়ে ইসলামের ব্যাপক ক্ষতি করে চলেছে!

যদি উপমহাদেশের মুসলিমরা নিজেদের ঈমান, সম্মান ও সম্পদের নিরাপত্তা আশা করে তাহলে তাদের জন্য,

আলীগড় আন্দোলনের আদর্শিক সন্তান, নব্য ব্রিটিশ, বাকপটু সেক্যুলার নেতাদের পরিত্যাগ করা চাই!

পাশাপাশি, সঠিক মানহাজ ও নের্তৃত্ব চিহ্নিত ও অনুসরণ করা উম্মাহর জন্য অপরিহার্য।

(২) বাঘ ও বেঈমান

ব্রিটিশ রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় স্যার সৈয়দ আহমেদ 'আলীগড় আন্দোলন' সূচনা করেন। এবং প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিমদের 'ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক মানুষ' বানানোর নিমিত্তে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়।

উপমহাদেশে ইংরেজদের বিতারিত করে ৬০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শাসন ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে, ইংরেজদের গোলামী মেনে নিয়ে বাদামি চামড়া ইংরেজ হয়ে রুটি-রুজি আর কাফেরদের কাছে পদলাভ আর সম্মানিত হওয়ার তত্ত্ব ও দাওয়াতই ছিল আলীগড় আন্দোলনের মূল উপজীব্য।

ক্রমান্বয়ে ইসলামের দাওয়াত ও পরিভাষাকে ব্রিটিশদের উপযোগী আধুনিকায়নে বিস্তর লেখালেখি, শিক্ষাপ্রদান ও কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হয় স্যার সৈয়দ আহমদ ও আলীগড়িরা!

যাদের মধ্যে মহসিনুল মুলক, ভিকারুল মুলক, সৈয়দ আমীর আলী, নবাব সলিমুল্লাহ খান প্রমুখ অন্যতম।

পরবর্তীতে এই আন্দোলনের অগ্রগামী নেতারাই ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠা করে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'।

এবং আলীগড়িদের অন্য একটি দল হিন্দু প্রভাবিত কংগ্রেসে যোগদান করে। যার মাঝে ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ আলি, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। দ্রষ্টব্য যে, এই সেকুলার মানসিকতাসম্পন্নদের মাওলানা উপাধি দেয় মূলত ফিরিঙ্গি ব্রিটিশরা।

সেকুলার চিন্তাধারায় প্রভাবিত মুসলিম নামধারী নের্তৃত্বের অধীনে মুসলিম লীগ নামক দলটি স্যার সৈয়দ আহমদ ও আলীগড় আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রতিমূর্তি হিসেবে যাত্রা শুরু করে।

মুসলিম লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রায় সবটাই ছিল স্যার সৈয়দের ভাবাদর্শ ও চিন্তা-চেতনার একনিষ্ঠ অনুসারী এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। তাদের অনেকেই স্যার সৈয়দের চেয়েও কট্টর সেকুলার ছিল। আবার কেউ কেউ ছিল পরিষ্কার আল্লাহদ্রোহী কিংবা কাদিয়ানি!!

ইসলামের বিজয় বা শরিয়াহর শাসনের চিন্তা এসকল নের্তৃবৃন্দের কল্পনাতেও ছিল না।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে আলীগড় আন্দোলনের প্রভাবদুষ্ট ব্যক্তিদের পাশাপাশি কট্টর সেকুলার ও 'ইংরেজপন্থী উচ্চশিক্ষিত'রাই এই প্লাটফর্মে জড়ো হতে থাকে।

এমনকি একসময় ইংরেজদের অপ্রকাশ্য মদদে এদের দ্বারাই মুসলিম লীগ নামক তথাকথিত 'মুসলিমপন্থী' দলটির শীর্ষস্থান পুরোপুরি দখল হয়ে যায়। যাদের মধ্যে রয়েছে, ইংল্যান্ডে বেড়ে ওঠা ব্যারিস্টার ও শিয়া মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ইংরেজদের আস্থাভাজন কাদিয়ানী জাফরুল্লাহ খান, তাগুত আগা খান প্রমুখ।

পূর্ব বাংলায় তাদের প্রতিনিধিদের মাঝে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিল,

ব্রিটিশ আইনে দীক্ষিত এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং র‍্যাডিকাল বামপন্থী আবুল হাশেম প্রমুখ।

আর পাঞ্জাবে ছিল সিকান্দার হায়াত খানের মতো ইংরেজবান্ধব সেকুল্যাররা।

সেক্যুলার চিন্তাধারার বিকাশে এবং উপমহাদেশীয় প্রশাসনসহ বিভিন্ন স্থানে ইংরেজদের সেবাদাসের অভাব ঘোচাতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রায় সবগুলোই হয় হিন্দুত্ববাদী অথবা আলীগড়ি চিন্তাধারার সেক্যুলারদের হাতে গড়া।

এই সকল সেক্যুলার ভাবাদর্শের নামধারী মুসলিমরা ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থের ব্যাপারে ততটুকুই বলতো বা করতো যতটুকু ব্রিটিশদের সাথে দরকষাকষির ক্ষেত্রে কাজে দিত।

কেননা ব্রিটিশরা এই সকল নের্তৃবৃন্দ যেন বিদ্রোহী না হয়ে ওঠে সেজন্য প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধাও নিয়মিত দিয়ে থাকতো।

ব্রিটিশরাও তাদের ন্যুনতম স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন দিতে কার্পন্য করতো না। এর অন্যতম কারণ ছিল, যেন ইসলামের প্রকৃত নের্তৃত্বের পরিবর্তে তাদের এই সকল আজ্ঞাবাহী প্রতারকদের অধীনেই মুসলিমদের সন্তুষ্ট রাখা যায়।

যেন সম্ভাব্য দমন-পীড়ন-শোষন সত্ত্বেও যেন মর্যাদাবান এই জাতিটিকে কপট নেতাদের মাধ্যমে ভয়, আশা ও প্রলোভনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।

ইতিহাসের একজন সাধারণ ছাত্রও যদি সলিমুল্লাহ খান, লিয়াকত আলী খান, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, এ কে ফজলুল হক বা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবনাচরণ বক্তব্যাদি ও চিন্তা-চেতনার নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করে, তাহলে এবিষয়টি স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠবে যে- এসকল লোক আগাগোড়াই ছিল ব্রিটিশ তরবিয়তে বেড়ে ওঠা সেক্যুলার।

কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের আলীগড়ি সেক্যুলার মানসিকতায় ইসলামের মৌলিক কোন ভুমিকা ছিল না; বরং ইসলাম ও মুসলিম শব্দ দুইটির মাধ্যমে তারা উপমহাদেশের অন্যতম বৃহৎ ও প্রভাবশালী জনগোষ্ঠীকে নিজেদের অর্থ ও ক্ষমতা লাভের জন্য মুদ্রার ন্যায় ব্যবহার করত।

১৯৩৫ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের অধীনে 'ভারত শাসন আইন-১৯৩৫' ঘোষিত হলে মুসলিম লীগ আশানুরূপ ফল করতে ব্যার্থ হয়।

ফলে কপট রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতের ইসলামপন্থী উলামায়ে কেরামদের ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং পাঞ্জাব ও বাংলার সেকুল্যার মুসলিম নেতাদের আকাঙ্ক্ষিত প্রয়োজনীয় শাসন ও কর্তৃত্ব দেওয়ার কথা বলে উভয় গ্রুপকে নিজ নের্তৃত্বে একত্রিত করতে সচেষ্ট হয়।

ঠিক যেন এ আয়াতের বাস্তব প্রতিফলন,

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا

"...আর তারা মাঝামাঝি একটা পথ অবলম্বন করতে চায়।" - (সূরা নিসা, ৪:১৫০)

ফলস্বরূপ অদ্ভুতভাবে ইতিহাসের পাতায় উঠে গেছে,

জিন্নাহর অধীনে আগাগোড়া সেকুল্যার শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, লিয়াকত আলি খান, আবুল হাশিম আর আগা খানদের সাথে একই প্ল্যাটফর্মে মুফতি শফি রহ., শাইখুল ইসলাম শাব্বির আহমদ উসমানি বা মাওলানা আতহার আলিদের একত্রিত হওয়ার অবিশ্বাস্য ও দুঃখজনক ঘটনা!!

জিন্নাহর প্রতিশ্রুতি পরবর্তীতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর, ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে প্রতারণারূপে আর সেকুল্যারদের সাথে ওয়াফাদারি হিসেবে প্রমাণিত হয়।

সমাজ ও রাষ্ট্রে ব্রাত্য হয় ইসলাম ও উলামায়ে কেরাম।

নের্তৃত্ব ও পলিসি তৈরিতে শীর্ষস্থান লাভ করে কট্টর সেকুল্যাররা।

সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করুন আল্লামা ইকবালের ছেলে পাকিস্তানের হাইকোর্টের বিচারপতি জাভেদ ইকবালকে, যিনি বলেন,

"কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আগাগোড়াই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ছিলেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের চিন্তা তার কল্পনাতেও ছিল না।"

সংক্ষেপে এই হল মুসলিম লীগ, তাদের অবিসংবাদিত নেতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও তাদের লিগেসির বাস্তবতা; যাদের নের্তৃত্বে ব্রিটিশ রাজের শাসন হতে মুক্ত হয়ে, অখন্ড ভারতের বিশাল অংশ হিন্দুদের হাতে ছেড়ে দিয়ে হলেও একটি ইসলামী

রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এবং আজো যে সেই জিন্নাহপন্থীদের পেছনে দাঁড়ানোর জন্য ইসলামের মুহাফেজরা প্রতিযোগিতা করে থাকে!

আজো তাদেরকে ইসলাম ও মুসলিমদের এক প্রতিরক্ষাব্যুহ মনে করা হয়। তাদের খেতাব করা হয়, কায়েদে আজম, শেরে বাংলা, দেশনায়ক, প্রকৃত বাঘসহ আরো নানাবিধ উপাধিসহকারে!!

১৯৪৭ এ ইসলামী সুশাসন ও নিরাপত্তার আশায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সেক্যুলার মুসলিম লীগ এবং তার অনুসারী উলামায়ে কেরামের আহবানে স্থানান্তরিত হতে গিয়ে নির্মমভাবে নিহত হয় পাঁচ লক্ষাধিক মুসলিম, ধর্ষিত হয় হাজার-হাজার নারী এবং বাস্তুহারা হয় এক কোটি মুসলমান!!!

অথচ আকাংখিত ইসলামী রাস্ট্রের পরিবর্তে উপমহাদেশের পূর্বাংশ বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় কায়েম হয়েছে ভারতের প্রভাব আর পশ্চিমাংশ পাকিস্তানে কায়েম হয়েছে চীন আর আমেরিকার প্রভাব!

শুধু নেই ইসলামের প্রভাব।

অথচ হতাশাজনকভাবে,

আজো বহু মুসলমান জিন্নাহদের উত্তরসূরী জিয়া, এরশাদ বা ইমরান খানকে ইসলামের খাদেম, ত্রাণকর্তা ভেবে থাকে!!

হ্যা! এদের বাগ্মীতা, ব্যাবস্থাপনার যোগ্যতা, সহনশীলতা বা বদান্যতার মত সহজাত নের্তৃত্বের কিছু গুণ রয়েছে।

وَ جَعَلۡنٰہُمۡ اَئِمَّۃً یَّدۡعُوۡنَ اِلَی النَّارِ ۚ وَ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ لَا یُنۡصَرُوۡنَ

তাদের জানা রয়েছে ইসলামী পরিভাষা ও সরলমনা মুসলিমদের বশে আনার কায়দা-কানুন।

কিন্তু তাদের মাঝে একই সাথে রয়েছে যে কোনো মূল্যে ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে বেঈমানির মাধ্যমে চীন, রাশিয়া বা পশ্চিমাদের কৃপাদৃস্টি অর্জনের সুসাব্যস্ত স্বভাব।

জাহান্নামদের দিকে আহবানকারী এসকল নেতাদের বাস্তবতা আল্লাহ তা আলা আগেই আমাদের জানিয়েছেন, যদিও আমরা তা থেকে গাফেল!

فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْۤا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَ اِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْۤا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

''.. অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি তোমাদের বিজয় হয় তবে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না' ? আর যদি কাফিরদের আংশিক বিজয় হয়, তবে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করিনি এবং মুমিনদের কবল থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করিনি' ?"

- (সূরা নিসা, ৪ঃ ১৪১)

আফসোস তো এই যে,

অবুঝ মুসলমান আর সরলমনা উলামায়ে কেরাম বুঝতে চান নি, চান না যে,

অগাস্ট কোঁৎ, জন লক আর থমাস হবসের তত্ত্ব পড়ে সম্মানী হওয়া সেক্যুলাররা কখনো মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আইন প্রণয়ন বা শাসনক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে মানতে সক্ষম নয়!

বর্তমানে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মুসলিম জাতিয়তাবাদী স্লোগানের ফেনা তোলা রাজনৈতিক দলগুলো মূলত জিন্নাহ ও মুসলিম লীগেরই প্রোটোটাইপই মাত্র! বিএনপি বা টিআইপি কেউই এর ব্যাতিক্রম নয়!

তাই এক গর্তে বারবার পা দেয়ার পছন্দনীয় অভ্যাস ত্যাগ করে, মুসলিমদের উচিৎ ইসলামের শত্রুদেরকে বন্ধু ভাবা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র সঠিক আন্দোলন ও নের্তৃত্বের পেছনেই জমা হওয়া!

(৩) আদিপাপঃ

ব্রিটিশরাজের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর পর হিন্দুরা দরকষাকষির মাধ্যমে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আদায়ে আরো তৎপর হতে ১৮৮৫ সালে গঠন করে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' নামক রাজনৈতিক সংগঠন।

ইংরেজ গভর্নরদের আশীর্বাদপুষ্ট রাজনৈতিক দলটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল অনেকটা এনজিও'র মত, যারা জনসাধারণের বিভিন্ন সমস্যা ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে তুলে ধরতো।

ব্রিটিশরা যখন উপমহাদেশের জনসাধারণকে ধোকা ও মায়াজালের মাঝে ফেলে রাখতে ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের সমন্বয়ে 'সাম্রাজ্যবাদী আইনসভা' গঠন করে, তখন কংগ্রেসের বিভিন্ন সময়ের নের্তৃবৃন্দকেই সেখানে জায়গা দেওয়া হয়।

আলীগড় আন্দোলনের প্রবাদপুরুষ স্যার সৈয়দ আহমাদও এই কুফরী সংঘের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দ্রুত শক্তিশালী হওয়া গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল ত্রিমূর্তি প্রভাবিত কংগ্রেস দলটি ব্রিটিশদের সাথে দরকষাকষির অন্যতম প্ল্যাটফর্ম হয়ে দাঁড়ায়।

১৯১৮-এ রুলেট এক্টের মাধ্যমে যে কোনো প্রকার ব্রিটিশ সমালোচনার মুখ বন্ধ করার বন্দোবস্ত করা হয়। বিনা ওজরে ঢালাও গ্রেফতার ও দমন-পীড়নের ফলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠে।

বিরোধীপক্ষের মধ্যে ব্রিটিশদের জন্য সর্বাপেক্ষা কম ক্ষতিকর এবং সবচেয়ে আপসকামী দুটি দল ছিল মূলতঃ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ।

এমনকি এক মেয়াদে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট থাকা সুভাষ বসুও কংগ্রেসের আপসকামী অবস্থানের বিরুদ্ধে অবস্থানগ্রহণ করেন।

রুলেট এক্টের পরপর শুরু হওয়া 'খেলাফত আন্দোলন' গান্ধীর সাথে মুসলিম নেতাদের কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

এসময়ই আলীগড় আন্দোলনের সেকুলার নেতাদের একাংশ 'মুসলিম পরিচয়টিকে দুনিয়াবী সুযোগ-সুবিধা আদায়'এর উদ্দেশ্যে কংগ্রেসে যোগ দেয়।

তন্মধ্যে আলীগড় আন্দোলনের মুখপাত্র মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ অন্যতম।

নামের শুরুতে মাওলানা উপাধি যোগ করা হলেও আগাগোড়াই তারা ছিলেন সেকুলার চিন্তাধারার ধারক।

ইসলামী শাসনের পুনরুত্থান বা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিবর্তে, কাফের হিন্দুদের অধীনে থেকে হলেও বৈষয়িক প্রভাব ও সুবিধা হাসিলে বিশাল মুসলিম জাতিগোষ্ঠীটিকে ব্যবহারই ছিল এদের উদ্দেশ্য। ঠিক যেমনটা ছিল মুসলিম লীগের নেতৃত্বেরও।

পরবর্তীকালে কংগ্রেসের অধীনস্ত মুসলিম নামধারী সেকুলার নেতারা ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী কর্মকান্ড বা হিন্দুদের জুলুম-আগ্রাসনের ক্ষেত্রে প্রায় সম্পূর্ণ নীরব থাকার দ্বারা উপমহাদেশে ইসলামের প্রভাব ও দাওয়াত বিনষ্ট করেছে অনেক বেশি।

পাশাপাশি কংগ্রেসের 'মুসলিম' নামধারী সেকুলার নেতৃবৃন্দ ইসলামের তুলনায় ভারতীয় স্বার্থের কথাই অধিক আলোচনা করে ভিন্ন মাত্রায় ক্ষতি সাধন করেছে এটাও বাস্তব।

সাধারণভাবে মুসলিম লীগ বা কংগ্রেসের মুসলিম নামধারী নেতৃবর্গ ছিল সেকুলার মানসিকতাসম্পন্ন এবং ভারতবর্ষের শরীয়াহর শাসন ফিরিয়ে আনার কোনো লক্ষ্য বা কর্মসূচি তাদের ছিল না।

ইসলামের কথা তাদের মুখে আসতো মূলত সরলমনা আলেম ও মুসলিম সমাজের সহানুভূতি ও সমর্থন অর্জনের জন্য। যার ফলে উলামায়ে কেরাম ও মুসলিম জনগোষ্ঠীকে দরকষাকষির মাধ্যম বানিয়ে তাদের ক্ষমতা অর্জনের দৌড়ে এগিয়ে যাওয়া সহজ হতো।

স্মর্তব্য যে, মুসলিম লীগ আর কংগ্রেসের 'মুসলিম' নেতাদের মাঝে যে মতপার্থক্য, তা কেবলই শাখাগত ও দুনিয়াবি চাহিদা চরিতার্থের বিভিন্নমুখী পলিসিকেন্দ্রিক। মৌলিকভাবে তারা অভিন্নই ছিল বটে।

তাদের পার্থক্যের মূল জায়গা শুধু এটাই যে,

-> কংগ্রেসপন্থী মুসলিম নামধারী নেতারা প্রাদেশিক ক্ষমতায়ন, আইনসভা ও প্রশাসনে আনুপাতিক হারে বিস্তার ও প্রভাব লাভের বিনিময়ে হিন্দুদের নেতৃত্ব মেনেই অখন্ড ভারতের দাবী আদায়ে আন্দোলনের পক্ষপাতিত্ব করতো।

-> আর মুসলিম লীগের বক্তব্য ছিল, হিন্দুদের অধীনে পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও প্রশাসনের সুবিধা অর্জন সম্ভব নয়। বিধায়, প্রয়োজনীয় ক্ষমতালাভে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠন করা প্রয়োজন, যদি বিশাল ভুখণ্ড হিন্দুদের হাতে ছেড়ে আসতে হয় তবুও।

লক্ষ্য করুন, উভয় চিন্তাধারা লালনকারী এসকল নামধারী মুসলিমদের মূল লক্ষ্য ছিল, পর্যাপ্ত ক্ষমতার চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। ইসলামী শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার কোনো চিন্তা বা প্রকল্প তাদের ছিল না।

তবে পরিতাপের বিষয়,

সরলমনা সাধারণ মুসলিম জনগণকে এসকল সেকুল্যার নের্তৃবৃন্দ ও দলগুলো ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়।

তারা কখনো হিন্দু ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের অধিকার আদায়ের দাবী তুলে,

কখনো হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় সোচ্চার হয়ে কিংবা উর্দু ভাষার রাস্ট্রীয়করণের আন্দোলনের মতো কর্মসূচীর মাধ্যমে নিজেদের 'মুসলিমবান্ধব' পরিচয় প্রমাণে ভালোভাবেই সফলতা অর্জন করে!

অথচ,

উলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মুসলিম জনসাধারণের সহযোগিতায় মুখরোচক আলোচনা ব্যতীত ইসলামের কোনো বাস্তব ভূমিকা তাদের ছিল না।

ব্যাক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের কিছু কিছু অংশে ইসলামের ভূমিকা তাদের কেউ কেউ স্বীকার করলেও, রাষ্ট্রের পরিচালনার প্রশ্নে ইসলামের ভূমিকা তারা প্রত্যাখান করেছিল। এমনটাই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের সর্বকনিষ্ঠ সভাপতি, অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতার দাবীদার, উপমহাদেশের মুসলিমদের অন্যতম 'নেতা' মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন,

"যদি আজ আসমান থেকে কোনো ফেরেশতা কুতুব মিনারের উপর নাযিল হয়ে বলে, হিন্দু-মুসলিম একতা ত্যাগ করা হলে, ২৪ ঘন্টার মধ্যে ভারত স্বাধীনতা/স্বরাজ অর্জন করবে; তবে আমি স্বাধীনতা/স্বরাজ ত্যাগ করতে রাজি আছি কিন্তু হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ছাড়তে রাজি নই!"

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, মুসলিম লীগের নেতা মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহর সেকুল্যার চিন্তার বহিঃপ্রকাশ দেখুন,

•

"রাজনীতিতে ধর্মের প্রবেশ কাম্য নয়। ধর্ম তো স্রেফ মানুষ আর খোদার মধ্যকার একটি বিষয়!

(Address to the Central Legislative Assembly, 7 February 1935]

"... মানবতার দাবীতে আমি মুসলিমদের চেয়েও বেশী শুদ্রদের প্রতি বেশী আন্তরিক।"

[address at the All India Muslim League session at Delhi, 1934]

"বিশ্বাস করুন, যখন আমি পাকিস্তানের দাবী জানাচ্ছি এর মানে এই নয় যে আমি মুসলিমদের জন্য লড়াই করছি।"

[Press Conference, 14 November 1946]

"ভুল বুঝবেন না। পাকিস্তান কোনো থিওক্রেসি (ধর্মীয় রাস্ট্র) বা অনুরূপ কিছু নয়।"

[Message to the people of Australia, 19 February 1948]

সুতরাং উপলব্ধি প্রয়োজন,

মানবতার শত্রু সেক্যুলারদের ক্ষেত্রে যে বাস্তবতাটি তৎকালীন ও বর্তমান মুসলিমদের বড় অংশটি উপলব্ধি করতে অপারগ হয়েছেন তা হচ্ছে, সেক্যুলার রাজনীতিবিদদের মাঝে আপনার মুসলিম পরিচয় দেয়া নিয়ে কোনো এলার্জি নেই!

মুসলিমদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান কিংবা নিরাপত্তা দিতেও সেক্যুলারদের কোনো সমস্যা নেই। সেক্যুলারদের একমাত্র সমস্যা হচ্ছে সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়াহর পূর্ণ কর্তৃত্বে।

সেক্যুলাররা ইসলামের মৌলিক বহু কিছুই আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে ফেলে দেয়, যখনই তা তাদের প্রবৃত্তি ও পশ্চিমপূজার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে খোদ ইসলামবিরোধী, সেক্যুলারদের ভাষ্য লক্ষ্য করা যাক।

আমেরিকার 'স্কুল অব সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিস' এর শিক্ষক, সেক্যুলার ও বামপন্থী লেখক সাইদ ইফতিখার আহমদ লিখেন,

"সেক্যুলার রাষ্ট্রের মূল বিষয়টা হল রাষ্ট্র ধর্মমত নির্বিশেষে সকল নাগরিকের ধর্ম পালনের সমান সুযোগ নিশ্চিত করবে। সকল ধর্মকেই রাষ্ট্র সমান ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করবে।

রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মের পরিচয়ে পরিচিত হবে না বা শুধু কোন একটি ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা করবে না। আবার কেউ যদি কোন ধর্ম পালন করতে না চায়, সেক্যুলার রাষ্ট্রে তার সে স্বাধীনতাও থাকবে।

রাষ্ট্র তাকে কোন বিশেষ ধর্ম পালনে বাধ্য করবে না। সেক্যুলার রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তির ধর্ম পরিচয় তার চাকরী, ব্যবসা বাণিজ্য বা রাজনীতি করবার অধিকারে প্রতিবন্ধক হবে না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সেক্যুলার রাষ্ট্রে কোন সরকারি অফিসে কেউ চাইলে যেমন নামাজ আদায় বা মিলাদের আয়োজন করতে পারবেন, আবার অন্য ধর্মালম্বীরা চাইলে, তাদের ধর্মের বিধি অনুযায়ী প্রার্থনা করতে পারবেন। প্রার্থনা করবার বা না করবার বিষয়ে সবার সমান স্বাধীনতা এবং অধিকার থাকবে।

বাম সংগঠনের নেতাকর্মীরা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে সব ধর্মের মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে সেক্যুলার রাষ্ট্র গড়ার সংগ্রামে রত আছেন। সকল মানুষের ধর্ম পালনের সমান স্বাধীনতা নিশ্চিত করবার জন্য তারা ১৯৪৭ সাল থেকে লড়াই করে আসছেন।

এখন এ লড়াইয়ে তারা কতটা আন্তরিক সেটা নির্ভর করছে, তাদের নেতাকর্মীদের নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম পালনের স্বাধীনতা বা পরিবেশ তাঁরা নিশ্চিত করতে পারছেন কিনা, তার উপর। আগামীদিনের সেক্যুলার বাংলাদেশ গড়ার লড়াইয়ে তাঁদের ভূমিকা- এ বিষয়টার সাথে যুক্ত।"

(ইফতিখার আহমদের বক্তব্য সমাপ্ত)

গুরুত্ব বিবেচনায় পুনরায় বলা হচ্ছে,

মুসলিম লীগ আর কংগ্রেসের 'মুসলিম' নেতাদের চিন্তাধারার পর্যায়ক্রমিক বিকাশের ফলেই পরবর্তীতে ব্রিটিশরাজের অধীনস্থ বেতনভোগী সরকারি চাকরিজীবী ও রাজনীতিবিদগণের আবির্ভাব ঘটে।

আর বর্তমান বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মুসলিম দাবীদার 'সেক্যুলার' চিন্তাচেতনার ধ্বজাধারী রাজনীতিবিদ ও আমলারা এদেরই উত্তরসূরী হয়ে আজো ঔপনিবেশিক আইন-কানুন ও সংস্কৃতির মুহাফেজ হয়ে জাতির উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে আছে।

আফসোসের বিষয়,

২০০ বছরের নিষ্পেষণ সত্ত্বেও, উপমহাদেশের মুসলিমদের বড় অংশটি বাংলাদেশের জাতীয় পার্টি, বিএনপি, ভারতের ইত্তেহাদুল ইসলামী কিংবা

পাকিস্তানের তেহরিকে ইনসাফ, পিপলস পার্টি ইত্যাদির মতো উপনিবেশের উত্তরাধিকারীদের চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়নি।

তবে সল্প পরিসরে হলেও এগোষ্ঠীটির ব্যাপারে শরীয়ত ও বাস্তবতার গভীর জ্ঞান লাভকারী উলামায়ে কেরামের চিন্তাও আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে,

"সেকুল্যার চিন্তা-চেতনা পোষণকারী এবং রাষ্ট্রপরিচালনায় শরিয়াহ শাসনকে অপরিহার্য মনে না করে ব্রিটিশ কানুনকে আঁকড়ে ধরা ব্যক্তিবর্গ, যতই নিজেদের ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে সম্পৃক্ত করুক না কেন তারা কুফরীর উপরে রয়েছে।"

ইরজায়ী আকিদার বিষে লীন কিংবা রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, সাংবিধানিক ও বিচারিক কাঠামো সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যতীত এবিষয়টি অস্পষ্ট থাকার কথা নয়।

কেননা একটু থেমে চিন্তা করলেই স্পষ্ট চোখে পড়ে যে,

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের পর, ব্রিটিশরাজ প্রণীত পূর্বের সংবিধান, প্রশাসনিক-আইনি কাঠামো এবং সেনাবাহিনী-পুলিশের গঠনকেই অবিকৃত রেখে ভারত ও পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র দুইটি পরিচালিত হতে থাকে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙ্গে সৃষ্ট হওয়া বাংলাদেশেও একই অবস্থা চলমান রয়েছে।

কিন্তু এটাও বাস্তব যে,

রাজনৈতিক নেতাদের চাতুর্যপূর্ণ বক্তব্য, পত্রপত্রিকা-মিডিয়া আর আলেম-উলামাদের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুল বা বিভ্রান্তির পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় পেটুয়া বাহিনীর দমন-পীড়নের ফলে, ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের বিষয়ে মুসলিমরা কিছুটা সচেতন হলেও, পরবর্তী ৭৫ বছর ধরে চলমান বাদামি চামড়ার ব্রিটিশদের শাসনের ব্যাপারে দুঃখজনকভাবে আজও উদাসীন।

যার ফলে উপমহাদেশ আজো ইনসাফ ও নিরাপত্তার মহানিয়ামত থেকে বঞ্চিত, যে নিয়ামতের স্বাদ সুদীর্ঘ ৮০০ বছর ধরে মুসলিম, হিন্দু নির্বিশেষে গোটা উপমহাদেশের সকল মানুষ ইসলামী শাসনের অধীনে আস্বাদন করেছিল।

এ নিয়ামত তথা উপমহাদেশে ইসলামের তামকিন পুনরুদ্ধারে উপমহাদেশের সবাইকে, বিশেষত মুসলিমদের জন্য ও তাদের বাতিঘর উলামায়ে কেরামের জন্য চলমান সমস্যাকে যথাযথভাবে চিহ্নিতপূর্বক উপলব্ধি করা সর্বাগ্রে অপরিহার্য।

আর এই আদি সমস্যাটি হচ্ছে, প্রোটেস্টেন্ট আন্দোলনের ঔরসে ইউরোপে পঞ্চদশ শতকে জন্ম নেয়া এবং অষ্টাদশ শতকে পরিপক্বতা লাভকারী বিষাক্ত মতবাদ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও সাংবিধানিক গণতন্ত্রের শাসন।

যা কি না উপমহাদেশে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে চাপিয়ে দিয়েছিল সাদা চামড়ার ব্রিটিশ আগ্রাসীরা।

আর বর্তমানে উপমহাদেশের তিনটি দেশের শাসকগোষ্ঠী, আমলাতন্ত্র, মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবিবর্গ মূলতঃ চিন্তাচেতনা, উদ্দেশ্য ও ফলাফলের দিক থেকে তাদের পূর্বসূরী ফিরিঙ্গি ও তাদের আদর্শিক সন্তান জিন্নাহ-আজাদদেরই একনিষ্ঠ উত্তরসূরী; যদিও হতে পারে তাদের চামড়ার রঙ, অবস্থানকাল বা জন্মস্থান আলাদা!!